দ্বিতীয় অংশ

লাভজনক উপায়ে মাছচাষ

মাছচাষে নিবিড়তাসহ চাষের ব্যাপক সম্পসারণ ঘটায় বাজারে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, মাছের বাজার দর বিগত ১০ বছরে অনেক ক্ষেত্রে কমেছে অনেকে মতামত দিয়ে থাকেন। আবার পুকুরের ভাড়া, মাছের খাদ্য মূল্য, শ্রমিক মজুরীসহ মাছচাষের বিভিন্ন উপকরণের দাম বৃদ্ধি সার্বিক পরিবেশকে বেশ জটিল করে তুলেছে। বাজারে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে অধিক ফলনশীল প্রজাতির মাছ যেমন পাংগাস, তেলাপিয়া, কৈ মাছের কেজি প্রতি দামে এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে চাষি এসব মাছচাষ কমিয়ে দিতে বাদ্ধ হচ্ছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বাৎসরিক মাছ উৎপাদনে নেতি বাচক প্রভাব পড়ার আশাঙ্খা ব্যাক্ত করতে শুরু করেছেন। চাষি পর্যায়েও হতাসার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকে মাছচাষে নিরুৎসাহিত হয়ে অন্য পেশার দিকে ঝুকে পড়ছেন যা আমাদের কোনভাবেই কাম্য নয়। বড় চাষিরা স্বউদ্বোগে মাছচাষের বিকল্প পদ্ধতির অনুসন্ধানে নিজস্ব আংগিকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাছচাষে মাছের প্রজাতী নির্বাচনে নানা মাত্রিক পরিবর্তন আনছেন। সম্পূর্ণভাবে একক মাছচাষ (Mono Culture) বলতে যা বোঝায় তা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। আমাদের দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে মাছের উৎপাদন কমে আসছে এবং এর বিপরীতে দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি (২০১৪-১৫ সালে ১৫ কেজি এবং ২০২০-২১ সালে ২৩.০০ কেজিতে উন্নীত) পাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে আগামী দিনে বাজারে মাছের চাহিদাও বৃদ্ধিপাবে এটাই স্বাভাবিক। উন্নত দেশের মাথাপিছু মাছ গ্রহণো হার আমাদের চেয়েও অনেক বেশি। কোরিয়ার জনগণ মাথাপিছু মাছ গ্রহণ করে ৭৮.৫০ কেজি (সবচেয়ে বেশি), নরওয়ে ৬৬.৬০ কেজি, পর্তুগাল ৬১.৫০ কেজি, থাইল্যান্ড ৩২.০০ কেজি এবং আমাদের দেশে ২৩.০ কেজি। দেশ যত অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হবে মানুষের খাবার প্লেটে ভাতের পরিমাণ কমে খাবারের অন্যান্য উপকরণ যেমন মাছ, মাংশ, শাখ-সব্জি, দুধ-ডিমসহ ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। মাছে–ভাতে বাঙ্গালী আমাদের খাদ্য তালিকায় সবসময় মাছের অগ্রাধীকার থাকবেই। এ জন্য মাছের উৎপাদন আমাদের বাড়াতেই হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের মাছ চাষিদের সাথে মতবিনিময়ে প্রাপ্ত তথ্য ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যমান অবস্থার মাঝে কি উপায়ে নিরাপদ এবং লাভ জনকভাবে মাছচাষ করা যায় সে বিষয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হলো।

চাষ প্রযুক্তি নির্বাচন

লাভ জনক মাছচাষের জন্য সঠিক মাছচাষ পদ্ধতি নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চাষি পর্যায়ে অনেক ধরনের মাছচাষ প্রচলিত আছে। নতুন চাষিরা অনেক সময় বিষয়টি ভালভাবে না বুঝে অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বা যথেষ্ট উপলব্ধি না করে মাছাষের প্রযুক্তি নির্বাচন করে মাছচাষ শুরু করেন এবং অনেক সময় চাষে অসফল হয়ে নিরুতসাহিত হয়ে পড়েন। এ জন্য মাছচাষ শুরুর আগে কি ধরনের মাছচাষ চলছে? তাঁর জন্য প্মথমিক পর্যায়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা সহজ হবে সে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। কোন একটি মাছচাষ পদ্ধতিতে লাভজনক বলেই যে সেটি আপনার জন্যও ভাল পদ্ধতি হবে সেটা অনেক সময় সঠিক নয়। অভিজ্ঞতা যে কোন একটি কাজে সফলতা লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বিষয়, বিশেষ করে মাছচাষ করার ক্ষেত্রে। এ জন্য যিনি মাছচাষে করতে চান তাঁর প্রথম কাজ হলো ছোট পরিসরে বাস্তবায়ন করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে বড় পরিসরে বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া। বর্তমান সময়ে বিদ্যমান সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এখানে কয়েকটি লাভজনক মাছচষের পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলোঃ

ক) বড় আকারের পোনা মজুদ করে কার্প মিশ্রচাষ ঃ যাদের বিনিয়োগ ক্ষমতা কম কিন্তু বড় আকারের জলাশয় আছে এবং লাভজনকভাবে মাছচাষ করতে চান তাঁরা এপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। সাধারণত ৫-৬ ইঞ্চি আকারের শতকে ৫০-৬০টি কার্পজাতীয় মাছের পোনা মজুদ করে মাছচাষের প্রচলন আছে কিন্তু বর্তমান এর চেয়ে ভাল পদ্ধতি ৫০০ গ্রাম এর বড় পোনা কম ঘনত্বে (৩০ শতকে ১৫০-২০০টি রুই; ৫০টি কাতল; ৫০টি মৃগেল এবং ১টি গ্রাসকার্প ও ১টি ব্লাককার্প) ছেড়ে অধিক বড় আকারের মাছ উৎপাদন করা হচ্ছে।

যত বড় আকারের পোনা মজুদ করা যাবে তত বেশি বড় আকারের দামি মাছ উৎপাদন করা যাবে। সাধারণভাবে নিয়মিত সার প্রয়োগ এর পাশাপাশি মাছের ওজনের উপর (৩-৫%) ভিত্তিকরে ডুবন্ত বা ভাসমান বা উভয় প্রকার খাবার প্রয়োগে এ মাছচাষ করা যেতে পারে। এতে মোট বিনিয়োগ তুলনামূলক কম তবে লাভের আনুপাতিক হার বেশি পাওয়া যাচ্ছে। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে মাছচাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাছের বাজার দর সব সময় ভাল পাওয়া যায়।

চিত্র ১ ঃ ছাড়ার উপযুক্ত কার্পজাতীয় মাছের পোনা

খ) তেলাপিয়ার সাথে কার্প মিশ্র চাষ ঃ একক মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে অনেকে শতকে ২০০-৩০০ পোনা মজুদ করে চাষ করে থাকেন এটা এখন আর লাভজনক হচ্ছে না। তেলাপিয়া মজুদ কমিয়ে শতকে ১৫০টি (১০ গ্রাম আকারের পোনা) এবং তার সাথে বড় আকারের কাতল ২টি, রুই ৭টি পোনা মজুদ (১৫০-২০০ গাম গজনের) করে ৩-৪ মাস চাষ করে যখন তেলাপিয়ার ৩-৪টিতে কেজি হবে তখন ১/৩ ভাগ তেলাপিয়া বিক্রয় করে দিয়ে আবার কয়েক মাস পরে যখন ২টিতে কেজি হবে তখন বাকি ২/৩ ভাগ হতে অর্ধেক তেলাপিয়া মাছ বিক্রয় করে দিতে হবে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট তেলাপিয়া প্রত্যেকটি যখন ১ কেজি হবে তখন সম্পূর্ণ মাছ বিক্রয় করে অধিক লাভবান হওয়া যেতে পারে। এসময় সকল রইজাতীয় মাছ ২-২.৫ কেজি হয়ে যায়। মাছচাষের মোট সময় কাল ৯-১০ মাস এবং এ পদ্ধতিতে একদিকে এক কালিন বিনিয়োগ কম হয় অন্যদিকে পুকুরের সার্বিক পরিবেশ ভাল থাকায় ঔষধের প্রয়োগের খরচ কম হয় এবং খাদ্যের রুপান্তর (FCR-Feed Conversion Ratio) হার ভাল হয়। পুকুরের জীবভর (Biomass) কম থাকায় মাছা চাষে বাড়তি কোন সমস্য দেখা যায় না। মাছ তুলনামূলক কম ঘনত্বে থাকে বলে বৃদ্ধি পায় স্বাচ্ছন্দে। এখানে মজার বিষয় হল পুকুরের আয় থেকেই মাছচাষ পরিচালনা করা যায় ফলে এককালীন বিনিয়োগ কম হয়।

গ) শিং, পাবদা এবং গুলসার সাথে কার্প মিশ্রচাষ ঃ শিং. পাবদা, গুলশা ও ট্যাংরা একক চাষে শতকে ১০০০-১৫০০ পোনা মজুদ করে পুকুরে মাছচাষ প্রচলন আছে, কিন্তু এখানে চাষিরা বেশ ঝুঁকির মধ্যে থাকেন অনেক ক্ষেত্রে রোগের প্রাদূর্ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছেন। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ চাষি এসব মাছ মিশ্র পদ্ধতি অণুসরণ করে সফলতা নিশ্চিত করছেন। এ ক্ষেত্রে মূল প্রজাতির (ধরুন পাবদা) মাছ কিছুটা কম মজুদ করে (শতকে ৬০০-৭০০টি) সাথে ৩০০-৫০০ টি শিং বা গুলসা এবং তার সাথে ১টি কাতল, ৪টি রুই ও ১টি মৃগেল এবং ১৫-২০টি তেলাপিয়া মজুদ করে চাষে সফলতা পাওয়া যাচ্ছে। চাষের সময় ৬-৭ মাসে রইজাতীয় মাছ ১.৫-২ কেজি হচ্ছে এবং তেলাপিয়া ১ কেজির উপরে বড় হচ্ছে। অনেকে বছরের শুরুতে ৩ মাসে একক কৈ মাছচাষ করে একটি ফলন তুলে পুকুর পুনরায় প্রস্তুত করে এ পদ্ধতিতে চাষে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। এক্ষেত্রে মাছচাষে উদ্ভুত সমস্যা কম দেখা যাচ্ছে এবং কোন কারণে একটি প্রজাতি ক্ষতি গ্রস্থ হলেও অন্য মাছে চাষির বিনিয়োগ লাভসহ উঠে আসছে।

ঘ) পাংগাস মাছের সাথে অন্য প্রজাতির মাছের মিশ্রচাশ ঃ শতকে ২০০-৩০০টি পোনা মজুদ করে একক পাংগাস চাষ এখন আর নাই বললেই চলে। অনেকেই পাংগাস চাষ সম্পূর্ণ ছেড়েও দিয়েছেন। আবার অনেকে সমস্যার মধ্যে থেকেও পাংগাস মাছচাষ চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা একক চাষের পরিবর্তে পাংগাসের সংখ্যা শতকে ৭০-১২০টিতে নামিয়ে সাথে ৫০-১০০টি তেলাপিয়া এবং ৮-১২টি বড় আকারের রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করে চাষ করছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। এখানে পাংগাস মাছকে লক্ষ করে গরম কালে ডুবন্ত বা ভাষমান এবং শীতে ভাষমান খাবার প্রয়োগ করে বছরে একটি ফসল চাষ করছেন। এক্ষেত্রে একক পাংগাস চাষের থেকে বিনিয়োগ কমে আসছে এবং মোট উৎপাদন কম হোলেও চাষি লোকসানের হাত থেকে মুক্ত হয়ে লাভ জনকভাবে মাছচাষ করতে পারছেন। পাংগাস মাছ বিক্রয়ে বিনিয়োগ উঠছে এবং অন্য প্রজাতির মাছসমূহ বিক্রয়ের অর্থ সম্পূর্ণটা লাভ হচ্ছে।

ঙ) পাংগাস মাছের সাথে শিং মাছচাষ ঃ পাংগাসের সাথে উপরে ('ঘ') আলোচিত অন্যান্য প্রজাতির মাছের ঘনত্বে কিছুটা পরিবর্তন করে সাথি ফসল হিসাবে শিং মাছের পোনা শতকে ৫০০-৬০০টি মজুদ করেও লাভজনকভাবে মাছচাষ করা যেতে পারে। এক্ষেতে সন্ধার সময় শিং মাছের নির্ধারিত পৃথক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। যদি শতকে ৫০-৭০টি শিং মাছের পোনা দেওয়া হয় তবে পৃথক খাবার না দিলেও উৎপাদন পাওয়া যায়। শিং মাছ যেখানেই দেয়া হোক না কেন এ মাছ ধরতে পুকুর সেচ দিতে হয়। এ জন্য যে পুকুর সেচ দিয়ে মাছ ধরা যাবে কেবল মাত্র সে সব পুকুরে শিং মাছের পোনা ছাড়া যাবে।

ঙ) কার্প জাতীয় মাছের সাথে অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষ ঃ প্রথমে ('ক' এ বর্ণিত) আলোচিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে যাদের বাড়তি বিনিয়োগের সামর্থ আছে বা পুকুরটিকে আরো নিবিড়ভাবে ব্যবহার করতে চান তাঁরা কার্পজাতীয় (মজুদ আকার ২০০-৩০০ গ্রাম) মিশ্র চাষের সাথে শিং অথবা পাবদা অথবা গুলসা শকতে ৫০০-৭০০টি মজুদ করে সন্ধাকালীন এ মাছের জন্য নির্ধারিত পৃথক খাবার প্রয়োগ করেও সফলভাবে মাছচাষ করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞ চাষিরা এ পদ্ধতিতে মাছচাষ করছেন। এক্ষেত্রে রুই জাতীয় মাছের ফলন অধিকতর ভাল হয় এবং সাথি ফসল হিসাবে নিরাপদভাবে বাড়তি আর একটি মাছের ফসল পাওয়া যায়।

চ) গলদা চিংড়ি বা মাছ ও কার্প মিশ্রচাষ ঃ কার্প মাছের ('ক' এ বর্ণিত ঘনত্বে মজুদ করে) সাথি ফসল হিসাবে গলদা চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্পজাতীয় মাছ মজুদের আগে শতক প্রতি ৮০-১০০টি হারে গলদা চিংড়ির পিএল ছেড়ে এক মাস নার্সারি করার পরে কার্প জাতীয় মাছ (শতকে ২০-২৫টি) মজুদ করতে হবে। অথবা চিংড়ির পিএল অন্য পুকুরে লালন পালন করে জুভেনাইল করে কার্পের (শতকে ৫০-৬০টি) সাথে ছাড়তে হবে।

জুভেনাইল কিনে ছাড়লে খরচ বেশি হতে পারে। এখানে চিংড়ির নির্ধারিত খাদ্য সন্ধার সময় দিতে হবে। চিংড়ির আশ্রয় নেবার জন্য ঝোপ দিতে হবে (৩০ শতকে ৫-৬টি)।তবে শতকে ২০-২৫টি জুভেনাইল ছাড়লে বাড়িতি কোন খাবার দিতে হবে না। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, চিংড়ি পুকুরে কোন প্রকার কিটনাশক (সুমিথিয়ন বা এজাতীয়) প্রয়োগ করা যাবে না এবং দ্রবণীয় অক্সিজেন (Dissolve Oxygen) স্বল্পতা পরিহার করতে হবে। মাছচাষের সময়কাল ৭-৮ মাস হলে চিংড়ি বা মাছ বাজারে বিক্রয় এর আকার হয়ে যায় এবং বাজারে এ মাছের ব্যাপক চাহিদার কারণে দাম পাওয়া যায় ভাল। স্থানীয় চাষিদের দ্বারা পরীক্ষামূলক চাষে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

চিত্র ২ ঃ গলদা চিংড়ি

ছ) শোল মাছচাষ ঃ নতুন মাছচাষর প্রজাতী হিসাবে শোল মাছের চাষ দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। যাদের একাধিক পুকুর আছে তাঁরা একটি ছোট পুডুর এ মাছচাষর জন্য বেছে নিতে পারেন। স্বল্প স্থানে অধিক ঘনত্বে (২০০টি প্রতি শতকে) এ মাছচাষ হচ্ছে, অনেকে গত বছর বেশ লাভবান হয়েছেন। এবছরও অনেকের পুকুরে এ মাছচাষ চলমান আছে এবং সকলে বেশ আশাবাদী এ মাছ নিয়ে। এ মাছের সুবিধা হলো ছোট বড় সকল জলাশয়ে অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়, ছায়াযুক্ত স্থানেও এ মাছচাষ করা যায়। বাজারে ব্যাপক চাহিদার কারণে দামও বেশি। এ মাছ অত্যন্ত জনপ্রিয়। বর্তমানে এ মাছের পোনা এবং প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাবার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশে এ মাছ খাঁচাতেও চাষ হচ্ছে। এ মাছের সাথে সাথি ফসল হিসাবে রুজাতীয় মাছচাষ করা যেতে পারে। তবে বড় আকারের পোনা মজুদ করতে হবে। এ মাছচাষের পুকুরে আগাছা রাখতে হয় কারণ এ মাছ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে এবং দিনের বেলা খাবার খেলেও সন্ধায় খাবার খেতে বেশি পছন্দ করে। এ মাছচাষে খাবার লাগে কম। তবে অনেকে পুকুরে পোনা দেয় এরুপ তেলাপিয়া ছেড়ে প্রাকৃতিক খাবারের যোগানের ব্যবস্থাও রেখে থাকেন। ছোট জাতের মাছের সরবরাহ করতে পারলে নিশ্চিতভাবে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। এ মাছচাষর জন্য পুকুরের চারিদেকে উচু নেটের বেড়া দিতে হবে। শীতের সময় ক্ষতরোগ একমাত্র সমস্যা, তবে শীতের শুরুতে চুন প্রয়োগ করলে রোগমুক্ত থাকা যায়।

যে কোন মাছচাষে সফল হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে

১. মাছচাষ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহণ

আমার একটি পুকুর আছে সেখানে কিছু মাছের পোনা অবমুক্ত করে কিছু খাবার এবং সার প্রয়োগ করলাম, মাছ বড় হল বাজারে নিলাম এবং বিক্রয় করে অনেক টাকা লাভ হবেন এটা আশা করে বর্তমান সময়ে মাছচাষ করা যাবে না। মাছচাষ করার আগে এবিষয়ে বিদ্যমান তথ্য বিস্তারিত জানতে হবে, যারা আগে থেকে মাছচাষ করছে এধরনের অভিজ্ঞদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে হবে। মাছচাষে কি কি সমস্যা উদ্ভব হতে পারে এবং সে সব সমস্যা কিভাবে দূর করা যাবে, কোথায় পোনা পাওয়া যায়, কি ধরনের খাবার মাছকে খাওয়াতে হবে, খাবার তৈরির উপকরণ এবং দামের বিষয়ে অবহিত থাকতে হবে। মাছচাষের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা গ্রহণ করে চাষে নামতে হবে। শুরুতে স্বল্প পরিসরে মাছচাষ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বড় পরিসরে যেতে হবে। মাছচাষ পরিচালনাই নিজেকে অবশ্যই সংযুক্ত রাখতে হবে। মোবাইলের উপর ভর করে অন্যের দ্বারা মাছচাষ পরিচালনা করে মাছচাষে লাভবান হওয়া যাবে না। মৎস্য খামার পরিচালনায় কর্মী নিয়োগে আত্মিয়তার চেয়ে অভিজ্ঞতার প্রাধান্য দিতে হবে। কর্মীদের মাছচাষের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করে সচেতন করে তুলতে হবে।

২. উপযুক্ত পুকুর নির্বাচন

যে প্রজাতির মাছচাষ করা হবে তার জন্য উপযুক্ত পুকুর নির্বাচন করতে হবে। সব পুকুরে সব ধরনের মাছচাষ করা যায় না। যেমন কৈ মাছচষের জন্য নিয়মিত পুকুরের পানি বের করে দেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ পকুরটি নদী বা খালের কাছে হলে ভাল হয়। পর্যাপ্ত আলো বাতাস সমৃদ্ধ উন্মুক্ত জায়গাতে কার্প জাতীয় মাছসহ পাবদা, গুলসা, চিংড়ি বা মাছচাষ করলে ভাল হবে। কিছুটা ছায়াযুক্ত জায়গা হলেও শিং, তেলাপিয়া বা শোল মাছচাষ করা যায়। পুকুরে পানির গভীরতা সব সময় ৭-৮ ফুট হতে হবে। কম গভীরতার পুকুরে মাছচাষ হয় তবে রোগ-ব্যাধীসহ অন্যান্য সমস্যা বেশি দেখা দেয়। বেশি গভীর পুকুরে পাংগাস মাছ ভাল হলেও অন্যান্য মাছের ফলন ভাল হয় না। বাণিজ্যিক পদ্ধতির বা নিবিড় পদ্ধতির মাছচাষে রৌদ্রউজ্জল বেলে দোঁয়াশ মাটির পুকুর ভাল, বিশেষ করে যে পুকুরের নিজস্ব উর্বরা শক্তি কম । আগে দোঁয়াশ মাটির উর্বর পুকুরকে মাছচাষের উপযুক্ত মনে করা হত। কারণ প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর মাছচাষ পরিবর্তিত হয়ে সম্পূরক খাবার নির্ভর মাছচাষের দিকে রুপান্তর ঘটছে যেখানে পুকুরের নিজস্ব উর্বরা শক্তির তেমন কোন ভূমিকা নাই। বরং ও ধরনের পুকুরে মাছচাষে গ্যাসের সমস্যা হতে দেখা যায়।

৩. মাছচাষের সময় নির্বাচন

বছরের সব সময় বাজারে মাছের দাম একই রুপ থাকে না। এজন্য মাছ কখন চাষ শুরু করতে হবে কখন বিক্রয় করতে হবে সে বিষয়ে আগেই হিসাব করে মাছচাষ করতে হবে। সাধারণত মার্চ মাসের দিকে মাছের দাম বাড়তে থাকে এবং আগস্ট পর্যন্ত দাম ভাল থাকে এসময় মাছ বিক্রয় করা যাবে এভাবে হিসাব করে মাছচাষ করতে হবে। কিন্তু আবার মনে রাখতে হবে কিছু কিছু প্রজাতির মাছ শীতে বেশ নাজুক অবস্থার মাঝে পড়ে সে জন্য সে সব মাছ শীত কাল পার করার জন্য বিশেষভাবে সতর্কতার সাথে যত্ন নিতে হবে। শীতের সময় মাছ বিক্রয় করা ছাড়া মাছের পুকুরে জাল টানা ঠিক নয় এবং এ সময়ে পোনা মাছ ধরা বা পরিবহন নিরাপদ নয়। শীতে প্রতিদিন ভোরে গভীর নল কূপের আয়রন ফ্রি পানি ফোয়ারা আকারে দিতে হবে। তা হলে পুকুরের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি করা যায় এবং মাছ স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

৪. পুকুরে মাছের ঘনত্ব

মাছচাষে একেক প্রজাতির মাছ একেক ঘনত্বে মজুদ করতে হয়। তবে চাষের পুকুরে মাছের ঘনত্ব, মাছের উৎপাদন এবং প্রয়োগকৃত খাদ্যের খাদ্য রুপান্তর হারের (FCR) একটি সম্পর্ক আছে। মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে মাছের মোট উৎপাদন বেশী করা সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত খাদ্যের রুপান্তর হার ভাল হয় না, ফলে মাছচাষ লাভ কমে যেতে পারে। মাছচাষ উপযুক্ত (Optimum) ঘনত্বের বেশি মাছ ছাড়লে পুকুরের পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে এবং পরিবেশ ভাল রাখার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এর ফলে চাষ ব্যবস্থাপনার খরচ বেড়ে যায়, মাছের রোগের প্রাদূর্ভব দেখা দিতেও পারে। বাড়তি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে সফলভাবে মাছচাষ সম্পন্ন করে মাছ বাজারে প্রেরণ করা সম্ভব হোলেও মাছচাষ প্রয়োগকৃত খাদ্যের খাদ্য রুপান্তরের হারের উপর নেতি বাচক প্রভাব পড়ার কারণে পরিশেষে কাঙ্খিত লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এজন্য মাছচাষ করতে হবে এমন একটি ঘনত্বে যেন মাছ কোন প্রকার পিড়ন অবস্থার সম্মূখিন না হয়ে দ্রুত বড় হতে পারে। অধিক উৎপাদনে অধিক লাভ মাছচাষ এ বক্তব্য সব সময় সঠিক নয়। একটি নির্দিষ্ট পুকুরে শতকে ১৫০টি পোনা ছেড়ে পাংগাস মাছচাষ করা যায় আবার ঐ একই পুকুরে শতকে ৩০০টি পোনা ছেড়েও চাষ করা যাবে। প্রথম পদ্ধতির তুলনায় ২য় পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন হবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে লাভের নিশ্চয়তা থাকলেও ২য় পদ্ধতিতে লাভ না হয়ে লোকশানও হতে পারে। কোন চাষি এমন মাছচাষ কখোনও করবে না যাতে লাভ নাই।

৫. মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মাছচাষ মোট বিনিয়োগের ৭০% অধিক খাদ্য খরচ। সে জন্য কোন খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছচাষ লাভ করা যাবে তা মাছের বাজার দর, মাছের প্রজাতি ও চাষ পদ্ধতি বিবেচনায় রেখে নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে মাছের বাজার দর বিষয়টিকে আরো কঠিন করে তুলেছে। বিদ্যমান অবস্থার মাঝে মাছ চাষিকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে মাছের খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। নিজে খাবার তৈরি করে ব্যবহার করলে খাদ্য খরচ কমে তবে সে ক্ষেত্রে শিং, পাবদা, গুলশা এবং কৈ মাছচাষ সফলতা পাওয়া যাবে না। রুই জাতীয় এবং পাংগাস-তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ভাল মানের উপকরণ সময় মত প্রাপ্তি। অনেকে এভাবে মাছচাষ করে বিদ্যমান বাজার দরের মাঝেও লাভবান হচ্ছেন। সকল মাছ চাষিকেই খাদ্যের রুপান্তর হার (FCR) বিষয়টি বুঝতে হবে কারণ মাছচাষ ব্যবহৃত খাদ্য দ্বারা মাছ প্রতিপালন করে লাভবান হওয়া যাবে কিনা তা চাষিকে মাছচাষ চলা কালীন খাদ্যের FCR হিসাব করে বুঝে নিতে হবে। প্রয়োজনে কম্পানি পরিবর্তন করতে হবে। FCR এর মান হিসাব করা কঠিন কিছু নয়।

কোন একটি খাদ্যের FCR = {(একটি নির্দিষ্ট সময় অর্জিত মাছের মোট ওজন - ছাড়ার সময় মোট মাছের ওজন)/উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে প্রদানকৃত মোট খাদ্যের পরিমাণ}

সহজ কথায় ১ কেজি মাছ উৎপাদন করতে কত কেজি খাবার প্রয়োজন হয়েছে সেটাই FCR। পাংগাস, তেলাপিয়া, কৈ ও রুই জাতিয় মাছের ক্ষেত্রে এক কেজি মাছ উৎপাদন করতে ভাষমান খাবার ১.২ কেজির বেশি লাগলে মাছচাষ লাভ কমে আসবে আবার ডুবন্ত খাবার ২ কেজির উপরে লাগলেও লভ্যাংশ কমে আসবে। এ জন্য সচেতন সব মাছ চাষিকে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। বছর শেষে হিসাব করে কোন লাভ হবে না। প্রতি মাসে নমুনায়ন করে FCR হিসাব করতে হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যের FCR মান নানা ভাবে প্রভাবিত হতে পারে যে সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করতে হবে।

৬. মাছচাষের পুকুরের পানি পরিবর্তন

আধুনিক মাছচাষ সম্পূণভাবে, পুকুরের পানি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে কৈ, তেলাপিয়া ও পাংগাস মাছচাষর পুকুরের পানি পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে। পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা না থাকলে সে পুকুরে কৈ মাছচাষ না করায় উত্তম। মাছচাষর পুকুরে প্রতিদিন খাবার প্রয়োগ করতে হয়। মাছ পুকুরের পানিতেই পায়খানা করে। অবশিষ্ট খাবার এবং মাছের পায়খানার (Excreta) কারণে পুকুরের পানি সহজে ভারী হয়ে দূষিত হয়ে যায়। পানি পরিবর্তন করলে পুকুরের এ সমস্যসহ অনেক সমস্যাই সহজে সমাধান করা যায়। মাছের যে কোন রোগ দেখা দিলে পানি পরিবর্তন সর্ব্বোত্তম সমাধান। শীতের সময় পুকুরে পানি দিতে পারলে মাছ স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এবং খাবার গ্রহণ হার বৃদ্ধি পায়। পুকুরের পানির অক্সিজেন মাত্রা বাড়াবার সহজ উপায় পুকুরে পানি সরবরাহ। তবে সরবরাহকৃত পানি অবশ্যই আয়রন মুক্ত হতে হবে। বর্তমানে অনেকে পুকুরে তলার কেন্দ্রস্থলে তুলনামূলক গভীর করে সাবমার্চএবল

পাম্পের মাধ্যমে নিয়মিত তলদেশ থেকে ময়লাসহ পানি বের করে দিচ্ছেন, তুলনামূলক অধীক ঘনত্বে মাছচাষ করছেন এবং সাধারণ উৎপাদন থেকে কয়েকগুণ বেশি মাছ উৎপাদনে সামর্থ হচ্ছেন যাকে বটোমক্লিন পদ্ধতি বা পুকুরের টয়লেট পদ্ধতি বলা হচ্ছে। পুকুরের তলদেশে হতে মাছের পায়খানাসহ সকল জৈব পদার্থ বের করে দেয়ায় পুকুরের সার্বিক পরিবেশ ভাল থাকছে এবং পুকুরে কোন প্রকার গ্যাসের সমস্যা হচ্ছে না মাছ ভালো পরিবেশ পাওয়ায় স্বচ্ছন্দে বেড়ে উঠছে। এ ক্ষেত্রে পুকুরে মাছচাষে বিভিন্ন প্রকার একোয়াপ্রডাক্ট/মেডিসিন ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসছে।

৭. মাছচাষের পুকুরে এ্যারেটর স্থাপন

বর্তমান সময় আধুনিক প্রযুক্তির জয়জয়কার। মাছচাষর পুকুরে এ্যারেটর সংযোজন করতে পারলে নিরাপদ মাছচাষ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। মাছ চাপষের পুকুরের দ্রবণীয় অক্সিজেনেরে (Dissolve Oxygen) অভাব একটি সাধারণ সমস্যা। যান্ত্রিক এ্যারেটর এসমস্যা দূর করা ছাড়াও পুকুরের সাধারণ অক্সিজেনের মাত্রা (৫ পিপিএম) বাড়িয়ে দেয় ফলে মাছের খাদ্য গ্রহণ হারসহ খাদ্যের হজম হার বৃদ্ধি পায়। মাছের শরীরে খাদ্যের আত্তিকরণ (Assimilation) বৃদ্ধি পায় ফলে সার্বিকভাবে খাদ্যের FCR এর মান ভাল হয়। ফলে কম খাবারে মাছের অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় মাছ চাষিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, ৫ বছর আগের বাজারে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্য আর বর্তমানে প্রাপ্ত খাদ্যের মানগত দিক দিয়ে অধিক ভাল এবং পরিপূর্ণ (Balance)। খাদ্যে আমিষের পূর্ণতা (Completeness) এবং ভারসাম্যের কারণে খাদ্যের পুষ্টিমান অনেক উন্নত হয়েছে। অধিক পুষ্টিকর খাবার প্রদানে মাছচাষ করলে পুকুরের পানির দ্রবণীয় অক্সিজেন মাত্রা সাধারণ মাত্রার থেকে অবশ্যই বেশি থাকতে হবে। কারণ অধিক পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে তার হজমের জন্য শরীরে শক্তি অধিক ব্যায় করতে হয়। শক্তি যোগানে রক্ত প্রবাহে অক্সিজেনের মাত্রা একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান। যেমন আমরা মানুষরা যখন অধিক পুষ্টি বা আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য বেশি গ্রহণ করি তখন কিছুটা অস্বস্থি বোধকরি এবং শরীরে ঘামের সৃষ্টি হয়। অধিক আরামের জন্য আমরা গাছের নীচে শুশিতল ছায়ায় বা ফ্যানের বাতাসে বসি কারণ খাদ্য গ্রহণের পর আমাদের শরীরের বিপাক ক্রিয়া (Physiological Activities) শুরু হয়ে যায় এবং আমিষ ভেঙ্গে সরলীকরণে অধিক শক্তি ক্ষয় হয় এবং এই শক্তির যোগান দিতে বাড়তি অক্সিজেনের এবং পানির প্রয়োজন হয়। বিষয়টি মাছের ক্ষেত্রেও অনুরুপ। মাছকে আমরা বর্তমানে বেশ উন্নত মানের অধিক আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াচ্ছি ফলে তাকে বাড়তি অক্সিজেনের সংস্থান না করলে খাদ্য সঠিকভাবে হজম হবে না এবং শরীরে আত্তিকরণের পরিমাণ কমে যাবে এবং মূল্যবান খাদ্য পায়খানা আকারে বের হয়ে আসবে। এর ফলে একদিকে মূল্যবান খাদ্যের অপচয় ঘটল এবং পুকুরের পানিতে অনাত্তিকৃত খাদ্যের অংশ যুক্ত হয়ে পুকুরের পানির পরিবেশ দ্রুত নষ্ট করে ফেলে। তাই যে সব মৎস্য খামারে উন্নতমানের খাবার ব্যবহার করে মাছচাষ করা হচ্ছে তাদের অনতি বিলম্বে এ্যারেটর সংযুক্ত করা উচিত। এতে যে শুধু খাদ্যের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে তা নয়, চাষের পুকুরে উদ্ভুত নানা ধরনের গ্যাসের সমস্য উপসমে কাজ হবে।

এ্যারেটর ব্যবহার করলে পানিতে শ্রোত সৃষ্টি হয় তাতে পানির উপর-নীচে পরিসঞ্চালনের সৃষ্টি হয় এবং পুকুরের তলার পানি বাতাসের সংস্পর্শে আসার কারণে পানি থেকে দ্রবিভূত নানা ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ফিরে যায়। যারা এ্যারেটর ব্যাবহার করছেন তাঁদের বক্তব্য এর ব্যবহারে মাছের খামারে ঔষধ ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসে। এ্যারেটর ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা অধিক ঘনত্বে মাছচাষ করা যায়। স্বল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় বলে এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিংড়ি বা মাছ চাষির জন্য এ্যারেটর খুবই উপকারি।

ছবি ঃ প্যাডেল হুইল এ্যারেটর

৮. নিয়মিত প্রোবায়োটিক্স ব্যবহার

বর্তমান মাছচাষ প্রোয়োবায়টিক্সের ব্যবহার মাছের পুকুরের পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা রাখছে। প্রোবায়োটিক্স হচ্ছে পুকুরে উপকারী ব্যবক্টেরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির উপকরণ। মাছচাষর পুকুরের তলদেশে প্রতিনিয়ত জৈব পঁচনশীল দ্রব্য জমতে থাকে। এই জৈব পদার্থ পুকুরের তলদেশে পঁচে ক্ষতিকর গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং পুকুরে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হতে পারে। প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগের ফলে পুকুরে উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার পর্যাপ্ত সৃষ্টি হওয়ার কারণে ক্ষতিকর ব্যাক্টেপিয়া উৎপাদন প্রতিহত হয়। পুকুরের পরিবেশ উন্নয়ন এবং মাছচাষকে নিরাপদ রাখার জন্য বাজারে প্রাপ্ত যে কোন প্রোবায়োটিক্স ২০-২৫ দিন পরপর প্রয়োগ করতে হবে। প্রোবায়োটিক্স বাজারে দুই ধরনের আছে, কয়েক প্রকার আছে যা ব্যবহারের আগে চিনির পানিতে ২৪ ঘন্টা প্রতিপালন করে ব্যাবহার করতে হয় আর কিছু আছে পুকুরে সরাসরি প্রয়োগ করতে হয়। প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগের পর পুকুরে কোন প্রকার বাক্টেরিয়া নাশক (Sanitizer) প্রয়োগ করা যাবে না।

৯. মাছচাষে ব্যাক্টেরিয়া নাশক (Sanitizer) ব্যবহার

বর্তমান সময়ে মাছচষে নিবিড়তা বৃদ্ধির কারণে মাছচাষে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়ছে। চাষি চাষের মাছকে নিরাপদ রাখার জন্য নান প্রকার ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে থাকেন। যার একটি ১-২ মাস পরপর পুকুরে ব্যাক্টেরিয়া নাশক প্রয়োগ। বিশেষ করে যারা পাবদা-গুলশা, শিং-ট্যাংরা এবং বড় আকারের রুই জাতীয় মাছচাষ করছেন। তবে মনে রাখতে হবে ব্যাক্টেরিয়া নাশক ব্যবহার করলে উপাকারী ও ক্ষতিকর উভয় ধরনের সকল ব্যাক্টেরিয়া মারা যায় যা পুকুরের তলদেশে জৈব-অজৈবের যে আদান প্রদান বা কিছু ক্ষতিকর গ্যাসিয় (এমোনিয়া, নাইট্রাইট) পদার্থের রুপান্ত বিগ্নিত হয় যা মাছচাষের পরিবেশের জন্য ভাল নয়। এ জন্য সেনিটাইজার ব্যাবহারের ৩-৪ দিন পরে এক ডোজ প্রোবায়টিক্স ব্যবহার করতে হবে।

১০. মাছচাষ উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে অব্যবস্থাপনা

মাছচাষে নানা ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হয়ে থাকে। মাছের বিভিন্ন রোগ ছাড়াও নানা ধরনের ক্ষতিকর গ্যাসের কারণে মাছে মড়ক দেখা দেয়। পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ একটি আদর্শ মাত্রায় না রাখা গেলেও চাষের মাছ সমম্যার মাঝে পড়ে। এ সব সমস্যা সমাধানে চাষি প্রাথমিকভাবে তাঁর খাদ্যের সরবরাহকারী দোকানদারের স্মরণাপন্ন হন অথবা বিভিন্ন ঔষধ বিক্রয়কারী কম্পানির বিপনণ প্রতিনিধির পরামর্শ গ্রহণ করেন। উভয় ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ঔষধ দ্বারা সমস্যার সমাধানের পারামর্শ দেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন ঔষধ প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে চাষি অনেক ক্ষেত্রে উপকার না পেলেও অনেক খরচের সম্মূখে পড়েন। এভাবে তাঁর উৎপাদন খরচ অনেকাংশে বেড়ে যায়। এখানে মাছ চাষিকে কেন্দ্র করে খাদ্যের ডিলার এবং বিপনণ প্রতিনিধির মধ্যে একটি দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে যার ফলে চাষি অধিক দামে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ঔষধ কিনতে বাদ্ধ হচ্ছেন এবং আর্থিক ক্ষতির মাঝে পড়তে দেখা যাচ্ছে। অনেক সময় চাষি নগদ অর্থের সংকটে খাদ্যের ডিলারের কাছ থেকে খাদ্যসহ ঔষধ বাকিতে ক্রয় করতে গিয়ে তাঁর মাছচাষর লভ্যাংশ বেশিরভাগ হারিয়ে ফেলেন। ডিলাররা সব সময় তাঁর সুবিধাটাকে প্রাধান্য দিবে এটাই স্বাভাবিক। সে বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য অবশ্যই বাড়িয়ে ধরবে। আবার অনেক চাষি স্বাধিনভাবে মাছ বিক্রয় করতেও পারেন না, তাঁর মাছ বিক্রয় করে খাদ্যের ডিলার এবং ডিলার বিক্রয়কৃত মাছের টাকা থেকে তাঁর পাওয়ানা পরিশোধ করে নেন। চাষি মাছচাষে লাভবান হতে এ চক্র থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে এবং নিজের স্বাধীন পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বক্ষমতা অর্জন করতে হবে তা হলে মাছচাষ লাভবান হতে পারবেন। প্রকৃত পক্ষে মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে বা চাষের মাছ যাতে সমস্যার মাঝে না পড়ে সে জন্য অভিজ্ঞ মাছ চাষি বা স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী চাষ পরিচালনা করলে অনেক সমস্যা পরিহার করা যায়। মাছচাষর ক্ষেত্রে মাছে যাতে কোন প্রকার রোগ ব্যাধি না হয় সে পদক্ষেপ অধিকতর শ্রেয় মাছের চিকিৎসা প্রদানের চেয়ে। সারা বিশ্বের মত মাছের চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের দেশও পিছিয়ে আছে। আর মাছে রোগ হলে প্রকৃত চিকিৎসা প্রয়োগেও সিমাবদ্ধতা আছে।

উপসংহার

মাছচাষ আগের মত আর লাভ হচ্ছেনা ঠিকই কিন্তু এর মাঝেও অনেকে সফলতার সাথে মাছচাষ করছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। বর্তমান সময়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে মাছচাষ যারা সফল হচ্ছেন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, বুঝে বুদ্ধিমত্যার সাথে মাছচাষ করলে অবশ্যই মাছচাষ লাভবান হওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে অবাধ তথ্য প্রবাহের সময়, আশে পাশে কে কি করছে জেনে, চোখ কান খোলা রেখে তথ্য অনুসন্ধান করে অথবা মৎস্য দপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে যাচায় বাছায় করে চাষের প্রযুক্তি নির্ধারণ করে একনিষ্ঠভাবে ধর্যসহকারে এগিয়ে গেলে যে কেহ মাছচাষ সফলতা লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অংশ

পুকরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান এবং উত্তম মাছচাষ অনুশীলন

"উত্তম মাছচাষ অনুশীলন" কেবল জনগণের স্বাস্থ্যগত বিষয় বিবেচনায় নিরাপদ মাছচাষ বা মাছ বিষয়ই আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু মাছচাষ (উৎপাদন) নিরাপদ বা লাভজনক করার বিয়টিও আলোচনায় আশা দরকার। মাছ পানিতে বসবাস করে মাছের উৎপাদন ভালো পেতে বা মাছচাষ লাভজনক করতে হলে মাছের বাসস্থান তথা পানির আদর্শ গুণাগুণ বিষয়ে ধারণা থাকা বিশেষভাবে গুরুত্বের দাবি রাখে। পানির গুণগতমান বলতে এর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অবস্থাকে বুঝায়। চিংড়ি বা মাছচাষে পানির গুণগত বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পানি, পোনা, খাদ্যের মান ও খামার ব্যবস্থাপনার ওপর উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে তবে শেষ পর্যন্ত পানির গুণগতমানই মৎস্যচাষের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করে থাকে। তাই পানির গুণাবলি ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। পানির এসব গুণাবলির একটি অনুকুল মাত্রা রয়েছে যা চিংড়ি বা মাছের ভাল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। চাষের পুরো সময় পানির গুণাগুণ অনুকূল মাত্রায় না থাকলে চিংড়ি বা মাছর ঘেরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয় বলে বাহির থেকে দেয়া সম্পূরক খাদ্যের ওপর চাপ পড়ায় অর্থের অপচয় হয়, চিংড়ি বা মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পীড়ন হয় এবং রোগবালাই দেখা দেয়ার ফলে উৎপাদন কমে যায়। শুধু তাই নয় এতে মাছ বা চিংড়ির গুণগতমান খারাপ হয়। একারণে মাছ বা চিংড়ির উৎপাদন ও গুণগতমান নিশ্চিত করতে পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করে উত্তম মাছচাষ অনুসীলন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১) পুকুরের পানির গভীরতা (Water Depth)

চিংড়ি বা মাছচাষকালীন সময়ে পুকুরে পরিমিত ও স্থিতিশীল গভীরতায় পানি ধরে রাখা অতি প্রয়োজন। দেশের অনেক অঞ্চলের পুকুর বা ঘেরে পানির গভীরতা কম থাকায় খরা মৌসুমে অতিরিক্ত সূর্যতাপে ঘেরের তলদেশ পর্যন্ত গরম হয়ে যায়। আবার অকস্মাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা দ্রুত অস্বাভাবিক হারে কমে যায়। তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার এই পরিবর্তনের ফলে মাছ বা চিংড়ির ওপর স্ট্রেস বা চাপ পড়ে। এতে চিংড়ি বা মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারা যায়। তাই পুকুরের পরিবেশ সমুন্নত রাখতে কাঙ্ক্ষিত গভীরতায় পানি ধরে রাখার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। পানির গভীরতা কম-বেশি হলে পানির গুণাগুণ হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়

- পানির তলদেশ গরম হয়;
- অন্ধকারপ্রিয় চিংড়ি বা মাছ অধিক আলোর যন্ত্রণায় ভোগে;
- তলদেশে অতিরিক্ত শাখা ও শিকড়যুক্ত উদ্ভিদ জন্মায়;
- পানির সঠিক গুণাগুণ স্থিতিশীল না থাকায় প্লাংকটন জন্মায় না;
- পুকুরের তলদেশে বেন্থজ (শামুক-ঝিনুক, কেচ ইত্যাদি) জন্মাতে পারে না;
- অতি বৃষ্টিতে পানির পিএইচ, তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়;
- পানির ঘোলাত্ব বেড়ে যায়।

এসব অসুবিধার কারণে পানির উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হয়, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, মাছ বা চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ কমে যায় এবং চিংড়ি বা মাছ দুর্বল হয়ে রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। কাজেই মৎস্য খামারে পানির গভীরতা ঠিক রাখতে হবে। মাছচাষের ঘেরে পানির গভীরতা- ১.২-১.৫ মি. বা তার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়

- ঘেরের তলদেশ মোটামুটি সমান হতে হবে;
- খামারে পানি কমে গেলে জোয়ারের পানি প্রবেশ করিয়ে বা পাম্প মেশিন দিয়ে পানি সরবরাহ করে গভীরতা বাড়াতে হবে;
- খামার প্রস্তুতির পূর্বে মাটি (খাল) কেটে গভীরতা বাড়িয়ে পরিমাণ মত পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়;
- বৃষ্টির সময় পানির গভীরতা বেড়ে গেলে অতিরিক্ত পানি নির্গমণ গেট দিয়ে বের করে দিতে হবে।

২) পানির তাপমাত্রা (Water Temperature)

পানির ভৌত গুণাগুণ নিয়ামকগুলির মধ্যে এককভাবে তাপমাত্রা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্য যে কোন একক উপাদানের চেয়ে তাপমাত্রা মাছের বৃদ্ধি ও উন্নয়নকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। মাছ শীতল রক্তের (Cold-Blooded) প্রাণী। ফলে এরা জলজ পরিবেশে যে তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকে প্রায় সেই তাপমাত্রা নিজের শরীরে ধারণ করে। তাই এরা তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না। পানির তাপমাত্রা মাছ বা চিংড়ির আচরণ, খাদ্য গ্রহণ, শারীরিক বৃদ্ধি, এবং বংশ বিস্তারসহ সকল জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ার ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, আমাদের দেশের চিংড়ি বা মাছ বা মাছচাষীরা অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি রাসায়নিক নিয়ামকসমূহের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ তাপমাত্রার বিষয়টিকে মোটেও আমলে নেয় না, যা সঠিক নয়। তাপমাত্রার পরিবর্তন পানির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকসমূহের মাত্রাতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় যা সমগ্র চিংড়ি বা মাছচাষর পরিবেশকে বিপন্ন করে তোলে।

তাপমাত্রা সমস্ত প্রাণীর জৈব-পরিপাক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে প্রাণীর সমস্ত জৈব ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, আবার তাপমাত্রা কমে গেলে পরিপাক ক্রিয়াও কমে যায়। ফলে খাদ্য গ্রহণের মাত্রাও কমে যায়। অন্যদিকে, জলজ পরিবেশের রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার ওপরও তাপমাত্রার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পানির তাপমাত্রা প্রতি ১০° সে বৃদ্ধির জন্য জলজ প্রাণীর জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পানির তাপমাত্রা ২০° থেকে ৩০° সে-এ বৃদ্ধি পেলে জলজ প্রাণীর অক্সিজেনের চাহিদা এবং খাদ্যের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ জলজ জীব ২০° সে তাপমাত্রায় যতটুকু দ্রবীভূত অক্সিজেন ও খাদ্য গ্রহণ করবে, ৩০° সে তাপমাত্রায় গ্রহণ করবে তার দ্বিগুণ।

মাছের বর্ধনের অনুকুল তাপমাত্রা ২৮-৩২° সে। মাছের জন্য পুকুরের পানির সকল গভীরতায় সমান তাপমাত্রা থাকা ভাল। এতে পানির সকল গভীরতায় সমান পুষ্টি উপাদান ও দ্রবীভূত গ্যাস মিশ্রিত থাকে। কিন্তু গরমের দিনে পানির উপরি-স্তরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পানি হালকা হয়ে যায়। অন্যদিকে, তলদেশের পানি ঠান্ডা ও ভারী থাকে। এই অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রা ও কম তাপমাত্রার পানির মধ্যবর্তী অংশে একটি হালকা স্তরীকরণের সৃষ্টি হলে হালকা ও ভারী পানির মিশ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ফটোসিনথেসিস ও বাতাসের সংস্পর্শে আসার সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে তলদেশের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। অন্যদিকে তলদেশে জমাকৃত বর্জ্যের পঁচন শুরু হওয়ায় সেখানকার কম অক্সিজেন আরও কমে যায়। ফলে তলদেশের পানিতে মারাত্মক অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়। এই অবস্থায় হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হলে উপরিভাগের উষ্ণ পানি ঠান্ডা হয়ে তলদেশের পানির সমান তাপমাত্রা ও ঘনত্বে চলে আসার ফলে তলদেশের কম অক্সিজেন সম্পন্ন পানির সাথে মিশ্রণ ঘটে। একে পন্ড-টার্নওভার বলে। এতে নিম্ন অক্সিজেন

সম্পন্ন তলদেশের পচা দ্রব্যাদি ঘেরের সকল অংশে সমানভাবে মিশে গিয়ে সমস্ত ঘেরে অক্সিজেনের মাত্রা সামগ্রিকভাবে কমিয়ে দেয়। এমতাবস্থায়, ঘেরের কোন অংশেই পর্যাপ্ত অক্সিজেন না থাকায় মাছ বা চিংড়ির জন্য নিরাপদ জায়গাই থাকে না। ফলে মাছ কম অক্সিজেন সিনড্রমে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়।

পানির তাপমাত্রার হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। তাপমাত্রা বেশি হলে অণুজীবের ক্রিয়াকলাপ ও পঁচনক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিকে যেমন অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন হ্রাস পায়, ঠিক তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত গ্যাসের (অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, ইত্যাদি) মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে চাষের পরিবেশ মাছের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠে, চিংড়ি বা মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। অতিরিক্ত সূর্যতাপে কিংবা হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা আকস্মিকভাবে কমে যাওয়ার কারণে মাছে মড়ক দেখা দেয়।

দেশের অধিকাংশ এলাকাতেই পুকুরের পানির তাপমাত্রার অধিক ওঠানামা লক্ষ করা যায়। খুলনা এলাকার পুকুরে অনেক সময় তাপমাত্রা ৩৮° সে থেকে ৩৯° সে পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে যা চিংড়ি বা মাছে পীড়নের সৃষ্টি করে। তাপমাত্রার এই সীমা চিংড়ি বা মাছচাষের যে কোন পর্যায়ে চিংড়ি বা মাছের আকস্মিক মৃত্যু ঘটাতে পারে এবং চিংড়ি বা মাছচাষীরা ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এবং মেঘলা পরিবেশে (মধ্যাহ্নে) তাপমাত্রার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ (যেমন পাম্প থেকে পানি সরবরাহ করা) এই পরিস্থিতি এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

পানির গভীরতা ন্যূনতম ১মি. এর বেশি রাখা সম্ভব হলে তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনে মাছের ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার ফলে উপরি-স্তরের পানির তাপমাত্রা বাড়লেও তলদেশের পানির তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এ্যারেটর ব্যবহার করে তাপমাত্রার এই পরিবর্তন হতে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

৩) বৃষ্টিপাত (Rainfall)

বৃষ্টির পানি কিছুটা অম্লীয়। কারণ বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং হ্যালোজেন জাতীয় গ্যাস বৃষ্টির পানিতে মিশে পানিকে অম্লীয় করে দেয়। ফলে বৃষ্টির পর ঘেরের পানির পিএইচ কমে যায়। তাছাড়া, বৃষ্টির পানি ঠান্ডা হওয়ার কারণে অগভীর ঘেরের পানির তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ায় চিংড়ি বা মাছর পীড়ন সৃষ্টি হয়। আবার বৃষ্টির পানি স্বাদু হওয়ায় অগভীর ঘেরের পানির লবণাক্ততাও হঠাৎ কমে যায় এবং চিংড়ি বা মাছ পীড়নের মধ্যে পড়ে। তাই দীর্ঘ খরার পর ভারী বৃষ্টির পরে পিএইচ, তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট পীড়নে চিংড়ি বা মাছ মারা যায়। এ ক্ষেত্রে ঘেরে পানির গভীরতা বাড়িয়ে এবং এ ধরনের ভারী বৃষ্টির পর পরই ঘেরের উপরি-স্তরের পানি বের করে দিয়ে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি হারে ডলোমাইট বা কৃষি চুন প্রয়োগ করে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। বৃষ্টির পানি ঘেরের পাড়ে পড়ে তা গড়িয়ে ঘেরে প্রবেশ করলে ঘেরের পানি ঘোলা হয়ে যায়। এ জন্য ঘেরের পাড়ে ঘাস জন্মানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) পানির রং ও স্বচ্ছতা (Water Colour and Transparency)

আমরা সকলেই জানি পানির নিজস্ব কোন রং নেই। চিংড়ি বা মাছচাষে পুকুরের পানির রং প্রাথমিক উৎপাদক (প্ল্যাংকটন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ পানিতে যে বর্ণের প্ল্যাংকটনের আধিক্য থাকে পানির রং সেই বর্ণ ধারণ করে। আবার উৎপাদনশীল পানির স্বচ্ছতা প্ল্যাংকটনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। প্ল্যাংকটনের পরিমাণ বেশি হলে স্বচ্ছতা কমে যায়। অনেক সময় পুকুরের পানি ঘোলাটে বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। এতে বুঝতে হবে যে, প্ল্যাংকটন মারা গেছে, যা প্লাংকটন ক্রাশ নামে পরিচিত। পানিতে কোন পুষ্টি উপাদান বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অভাব হলে অধিকাংশ প্ল্যাংকটন মরে যেতে থাকে। যদি পানির রং ফ্যাকাশে হয় এবং স্বচ্ছতা বেশি হয় তাহলে সেই পানি কম উৎপাদনশীল বলে বুঝতে হবে।

- মাছ চাষের ঘেরে পানির রং সবুজ বা হলুদাভ-সবুজ অথবা বাদামি বা বাদামি-সবুজ হওয়া উত্তম;
- প্ল্যাংকটনের উপস্থিতির কারণে পানির স্বচ্ছতা ৩০-৩৫ সেমি হলে ঐ পানি প্রাথমিক উৎপাদনশীল এবং চিংড়ি বা মাছচাষর জন্য উপযোগী;
- স্বচ্ছতা বেশি হলে অর্থাৎ পানি পরিষ্কার হলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (প্রতি ১৫ দিন) ইউরিয়া (১.০-১.৫ পিপিএম), টিএসপি (১.৫-২.০ পিপিএম) ও পটাশ (০.৩-০.৬ পিপিএম) সার প্রয়োগ ও পরিমিত চুন প্রয়োগ করতে হবে। এতে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ বেড়ে নির্দিষ্ট স্বচ্ছতা আসবে;
- স্বচ্ছতা কম হলে বা পানি কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে বেশি গাড় হলে চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- প্ল্যাংকটন ক্রাশ হলে বা পানি ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করলে পরিশ্রুত পানি দ্বারা দ্রুত পানি পরিবর্তন করে পরিমিত মাত্রায় চুন ও সার প্রয়োগ করলে এই অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে;
- সার প্রয়োগের পূর্বে ঘেরে জন্মানো যে কোন জলজ আগাছা পরিষ্কার করে তারপর সার প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায়

জলজ আগাছার উপদ্রব বেড়ে যেতে পারে।

৫) পানির ঘোলাত্ব (Turbidity)

ঘোলা পানি মোটেও মাছ/চিংড়ি বা মাছচাষর উপযুক্ত নয়। ঘোলাত্ব পানিতে ভাসমান বস্তুকে নির্দেশ করে। সাধারণত পানিতে ভাসমান অজৈব পদার্থ (কাদা, পলি, বালিকণা ইত্যাদি) দ্বারা ঘোলাত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে জৈবিক বস্তুর অধিক্যের কারণেও পানি ঘোলা হতে পারে। ঘোলা পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। ফলে পানির প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। চিংড়ি বা মাছের খাদ্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় এবং ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ পুকুরের তলদেশে থিতিয়ে পড়ায় চিংড়ি বা মাছর খাদ্য উপাদানসমূহ পলি বা কাদার নীচে হারিয়ে যেতে পারে।

ঘোলাত্বের কারণ (Causes For Turbidity)

বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

- অজৈবিক বস্তুঃ মৃত্তিকা কণা (পলি, কাদা), অন্যান্য অজৈবিক দানাদার পদার্থ ইত্যাদি
- জৈবিক বস্তু ঃ প্ল্যাংকটন (প্রধানতঃ উদ্ভিদকণা), জৈবিক পঁচনশীল পদার্থ ইত্যাদি

পানিতে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উপস্থিতির কারণে জৈবিক ঘোলাত্ব ঘটে যা জলাশয়ে খাদ্যচক্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কাজেই মাছচাষীদের জন্য এই ঘোলাত্ব কাঙ্ক্ষিত। পুকুরে মৃগেল ও কার্পিও মাছ বেশি থাকলে মাটির কণার ঘোলাত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। চিংড়ি বা মাছচাষের ক্ষেত্রে ঘোলাত্বকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পানির ঘোলাত্বের মাত্রা নির্ভর করে মাটির ধরন, ঋতু, পাড়ের চুয়ানো পদার্থ এবং তলদেশীয় জৈব পদার্থের পরিমাণের ওপর। ঘোলাত্বের মাত্রা ২০,০০০ মিগ্রা/লিটার বা এর অধিক হলে তা চিংড়ি বা মছের জন্য মারাত্মক হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিক ঘোলাত্ব জলাশয়ের উপরিতলে পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা ব্যাহত করে ও অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি করে। ঘোলাত্ব বিশেষ করে মাছের শ্বাস ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। এতে চিংড়ি বা মাছ অনেক সময় মারাও যায়।

ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণ

- ঘেরের তলায় অতিরিক্ত কাদা (৬ ইঞ্চির বেশি) থাকলে তা ঘের প্রস্তুতকালিন সময়ে সরিয়ে ফেলতে হবে;
- বৃষ্টির পানি যাতে গড়িয়ে ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে;
- ঘেরে পানি প্রবেশ পথ যদি কৃষি জমির সাথে যুক্ত থাকে তাহলে তা বন্ধ করে দিতে হবে;
- পাড়ে ঘাসের আবরণ সৃষ্টি করতে হবে;
- পানি পরিশোধনের জন্য ঘেরের আয়তনের ২০-২৫% জায়গায় আলাদা পুকুর বা ট্যাংক রাখতে হবে যাতে সেখানে নদীর ঘোলা পানি থিতিয়ে ও পরিমিত পরিশোধন করে ঘেরে সরবরাহ করা যায়;
- দীর্ঘ খালের মাধ্যমে পানি উঠালে ঘেরে প্রবেশের পূর্বে ঘোলাত্ব সৃষ্টিকারী অধিকাংশ কণা খালে থিতিয়ে পড়বে;
- পূর্ণ জোয়ারের সময় পুকুরে পানি উত্তোলন করলে অপেক্ষাকৃত কম ঘোলা পানি ঘেরে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে;
- পটাশ এলাম বা বাণিজ্যিক এলাম বা ফিটকিরি ২০০-৬০০ গ্রা/শতাংশ/৫ ফুট পানি- হারে পানিতে দ্রবণ তৈরি করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে;
- এগ্রিকালচারাল জীপসাম ঃ ১.৫-২.০ কেজি/শতাংশ/৫ ফুট পানি হারে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে;
- পোড়াচুন ঃ ০.৫-১.০ কেজি/শতাংশ হারে পানিতে গুলিয়ে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৬) লবণাক্ততা (Salinity)

চিংড়ি লবণাক্ততার ব্যাপক তারতম্য (০-৪০ পিপিটি) সহ্য করতে পারে। এমনকি এরা মিষ্টি পানিতেও বেঁচে থাকে তবে সেক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার কমে যায়। লবণাক্ততা চিংড়ি বা মাছের বিপাক, বৃদ্ধি, চলাচল, প্রজনন ইত্যাদিতে প্রভাব রাখে। ছোট অবস্থায় চিংড়ি বা মাছ সহনীয় পর্যায়ে লবণাক্ততার ওঠানামা সহ্য করতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ঘেরসমূহে পানির লবণাক্ততা সাধারণত চিংড়ি বা মাছচাষের উপযোগী থাকে। তবে দীর্ঘ খরার কারণে লবণাক্ততা বেড়ে যেতে পারে। আবার হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে লবণাক্ততা আকস্মিকভাবে কমে যেতে পারে। লবণাক্ততার এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে চিংড়ি বা মাছর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। চিংড়ি বা মাছচাষে পানির উপযুক্ত লবণাক্ততা ৫-২০ পিপিটি। তবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ১০-১৫ পিপিটি লবণাক্ততায় চিংড়ি বা মাছর উৎপাদন ভাল হয়। লবণাক্ততার হঠাৎ তারতম্য হলে চিংড়ি বা মাছর নিম্নবর্ণিত অসুবিধা হয় ঃ

- চিংড়ি বা মাছর দেহে পীড়ন ঘাঁয়;
- খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়;
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়;

- ❖ পানিতে উৎপাদিত প্লাংকটন মারা যায়;
- ❖ মাটি ও পানিতে পঁচনের সৃষ্টি হয়।

৭) ক্ষারত্ব ও খরতা (Alkalinity and Hardness)

পানিতে বিভিন্ন ক্ষার তথা কার্বনেট ও বাইকার্বনেটের ঘনত্বই হলো ক্ষারত্ব। আর ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব হচ্ছে খরতা, যা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$) পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। চিংড়ি বা মাছচাষের উপযোগী ক্ষারত্ব ও খরতার মান ৮০-২০০ মিগ্রা/লি যা বাংলাদেশের বেশিরভাগ পুকুরেই বিদ্যমান। আধালবণাক্ত পানি বা লবণাক্ত পানিতে সাধারণত উচ্চ ক্ষারত্ব ও খরতা থাকে যা প্রচুর পরিমাণে কার্বনেট, বাই-কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতি নির্দেশ করে। কার্বনেট ও বাইকার্বনেট হলো উদ্ভিদের কার্বনের উৎস যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা (কার্বহাইড্রেট) তৈরি করে।

$$6CO_2 + 6H_2O + \text{heat energy} \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

নিম্নলবণাক্তময় ম্যানগ্রোভ এলাকায় অম্লযুক্ত মাটি ও ফাইটোপ্লাংকটনের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে কখনো কখনো চিংড়ি বা মাছর পুকুরে ক্ষারত্ব অনাকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমে যেতে পারে।

ক্ষারত্ব ও খরতার প্রভাব (Effect of Alkalinity and Hardness)

"অম্ল নয় অল্প ক্ষার, এমন জলেই চিংড়ি বা মাছের বাড়"। চিংড়ি বা মাছচষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। ক্ষারত্ব ও খরতার মান ৮০ মিগ্রা/লি এর কম ও ২০০ মিগ্রা/লি এর বেশি হলে নিম্নরূপ সমস্যা হতে পারে ঃ

- ➢ পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, ফলে পিএইচ দ্রুত ওঠানামা করে;
- ➢ খামারে সার দিলে তা কার্যকর হয় না;
- ➢ চিংড়ি খোলস বদলাতে পারে না এবং খোলস নরম বা সফট সেল রোগের সৃষ্টি করে;
- ➢ ক্ষারত্ব ৩০০ মিগ্রা/লি এর বেশি হলে খামারের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বা ফাইটোপ্লাংকটনের পরিমাণ হ্রাস পায়। কারণ তখন সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে না;
- ➢ চিংড়ি বা মাছ সহজেই অম্লত্ব ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

ব্যবস্থাপনায় করণীয় (Measures Needed for Management)

খামারে নিয়মিত চুন (পাথুরে চুন/ডলোমাইট) অথবা জিপসাম প্রয়োগ করে ক্ষারত্ব ও খরতা নিয়ন্ত্রণ করা ভাল। পানির পিএইচ ও চুনের প্রকার এর ওপর নির্ভর করে প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৮) পিএইচ (pH)

পানির পিএইচ হলো অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সূচক। হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋনাত্মক লগারিদমের পরিমাপ দ্বারা ইহা প্রকাশ করা হয়। এর মাত্রা ০-১৪ স্কেলে প্রকাশ করা হয় যেখানে ৭ এর নিচের সংখ্যা অম্লত্ব এবং ৭ এর উপরের সংখ্যা পানির অ্যালকালিনিটি নির্দেশ করে। পিএইচ মান দ্বারা পানি অম্ল না ক্ষার তা বুঝা যায় যা পানির উৎপাদন ক্ষমতা নির্দেশ করে। পানিতে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতাসহ সংগঠিত সব ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া পানির পিএইচ এর মাত্রার উপর নির্ভরশীল। পিএইচ এর মান জানা থাকলে পানির অন্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। পিএইচ এর মান ৭ হলে তা নিরপেক্ষ পিএইচ হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে হাইড্রোজেন আয়নের দাতা এবং গ্রহীতা সমান সমান হয়। পিএইচ এর মাত্রা ৪ এর কম এবং ১১ এর বেশি হলে মাছ ও চিংড়ি বা মাছ মারা যেতে পারে। চিংড়ি বা মাছ খামারে পানির পিএইচ মান ৭.৫-৮.৫ হওয়া ভাল।

পিএইচ কম হলে চিংড়ি বা মাছর নিম্নরূপ সমস্যা হয় (Following Problems Occur Due to Low pH)

- ❖ চিংড়ি বা মাছর পীড়ণ হয় এবং মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে;
- ❖ চিংড়িতে নরম খোলস রোগ হয় এবং খোলস বদলাতে পারে না;
- ❖ চিংড়ি বা মাছের খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা কমে যায়;
- ❖ চিংড়ি বা মাছর রং কালো হয়ে যায় এবং পা, লেজ ও ফুলকা ক্ষয় হয়ে যায়;
- ❖ খামারে প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্ল্যাংকটন ও বেনথিক উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে, বংশ বিস্তার কমে যায় ও মারা যায়;

যে সব কারণে ঘের বা পুকুরে পানির পিএইচ ওঠানামা করে (Reasons for Fluctuation of pH in Gher or Pond)

- ❖ খামারে উদ্ভিদকণার আধিক্য হলে সারা দিন রৌদ্র ও তাপের প্রভাবে বিকেলে পিএইচ ৯ এর বেশি অর্থাৎ পানির ক্ষারভাব বেশি হতে দেখা যায়;

- খামারে শেওলা বা ডুবন্ত উদ্ভিদ বেশি থাকলে সারাদিন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-) তৈরি হওয়ার কারণে বিকেলে বা সূর্যাস্তের আগে পিএইচ সবচেয়ে বেশি হয়;
- খামারে অব্যবহৃত খাদ্য ও জৈব পদার্থের পঁচনের কারণে অথবা অবাঞ্ছিত শেওলা ও আগাছার পঁচনের কারণে পানির পিএইচ কমে যায়;
- ঘেরের মাটি অম্লীয় হলে পানির পিএইচ কম হয়। জৈব পর্দাথের পঁচন ও পানিতে বিদ্যমান জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে অম্ল তৈরি হয়;
- ধানের গোছা ও অন্যান্য আগাছার পচন এবং জৈব সারের আধিক্যের কারণে পিএইচ কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে পানি ওঠানো ও বের করার মাধ্যমে ঘেরের পানি পরিবর্তন করতে হয়;
- পানির পিএইচ কম হলে ঘেরে বিদ্যমান হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিষাক্ততা বেড়ে যায়;
- বৃষ্টিপাতের কারণে পানির পিএইচ কমে যায়। দীর্ঘদিন পর বড় ধরনের বৃষ্টি হলে পানির পিএইচ খুবই কমে যায় এবং এ অবস্থায় চিংড়ি বা মাছ মারা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনায় করণীয় (Measures Needed for Management)

সারাদিন পিএইচ যাতে বেশি ওঠানামা না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য নিয়মিত চুন প্রয়োগ, তলার পঁচন প্রশমন ও প্ল্যাংকটনের স্বাভাবিক উপস্থিতি বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া পিএল মজুদের ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী চিটাগুড়, ঈষ্ট ও অটোপালিশ ব্যবহার করা যায়। হেক্টর প্রতি অটো পালিশ ১০ কেজি, চিটাগুড় ১০ কেজি ও ঈস্ট ১০০ গ্রাম তিনগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ২৪ ঘন্টা পর ঘন নেটে ছেঁকে নিতে হবে। ছাঁকা পানি পুকুরের সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে একইভাবে একই পরিমাণে একই পদ্ধতিতে তিন চার দিন পর পর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট প্রকার চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়;
- নির্দিষ্ট মাত্রায় প্লাংকটন ব্লুম বজায় রেখে পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়;
- খামারের পানি বদল করে উদ্ভিদকণা কমানো যায় এবং পিএইচ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। বৃষ্টির পরপরই কৃষি চুন ($CaCO_3$), বা ডলোমাইট {$CaMg(CO_3)_2$} ২০০ গ্রাম অথবা পোড়া চুন (CaO) ১০০ গ্রাম প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করতে হবে;
- খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৯) দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen)

চিংড়ি বা মাছচাষে পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ নির্ধারক প্যারামিটার হল দ্রবীভূত অক্সিজেন। পানিতে দ্রবীভূত কম অক্সিজেন অন্যান্য সকল সমস্যার চেয়ে চিংড়ি বা মাছের মৃত্যুর জন্য বেশি দায়ী। মাছচাষের খামারে ৪-৮ পিপিএম (মিগ্রা/লি) দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা ভাল এবং কমপক্ষে ৩ পিপিএম অবশ্যই থাকা উচিত। তাপমাত্রার সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যেমন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। কম দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রতিকূল প্রভাবে চিংড়ি বা মাছর বৃদ্ধি কমে যায় এবং অধিকাংশ চিংড়ি বা মাছে রোগের বিস্তার ঘটে। এজন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা এবং কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে চিংড়ি বা মাছচাষীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পানিতে বিভিন্ন মাত্রার অক্সিজেন ও তার প্রভাব

দ্রবীভূত অক্সিজেন	প্রভাব
২ মিগ্রা/লি এর কম	কয়েক ঘন্টার বেশি স্থায়ী হলে মারাত্মক ক্ষতিকর ও চিংড়ি বা মাছর মৃত্যু হবে
২-৩ মিগ্রা/লি	চিংড়ি বা মাছ খাওয়া বন্ধ করবে ও দুর্বল হয়ে পড়বে
৪ মিগ্রা/লি	চিংড়ি বা মাছ খাদ্য খাবে কিন্তু পরিপাক ধীর গতিতে হবে
৫ মিগ্রা/লি এর বেশি	বৃদ্ধির জন্য অনুকূল অবস্থা

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন দৈনিকভিত্তিতে ও ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। অক্সিজেনের ঘনত্ব ভোর বেলা সাধারণত কম ও বিকেল বেলায় বেশি থাকে। তবে এটা মৌসুমের সাথেও পরিবর্তিত হয়। অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগের কারণেও ভোর বেলা দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত কমে যেতে পারে। পানির উচ্চ তাপমাত্রা, কম অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়া, অধিক চিংড়ি বা মাছ ও প্লাংকটনের আধিক্য এবং মেঘলা আবহাওয়া সমন্বিতভাবে পুকুরে বা ঘেরে অক্সিজেনের স্বল্পতা সৃষ্টি করে। মাছের পুকুরে/ঘেরে অক্সিজেনের চাহিদা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন- মজুদ ঘনত্ব এবং চিংড়ি বা মাছের জীবভর, খাদ্য প্রয়োগমাত্রা, মাটির জৈবিক গুণাগুণ, তলানিপড়া আবর্জনার পরিমাণ, প্লাংকটনের ঘনত্ব ও গঠন এবং পানি পরিবর্তনের হার। পুকুর/ঘেরের তলদেশে প্রায়ই তন্তুময় শৈবালের স্তরের সৃষ্টি হয়, যা উপরিভাগে ভেসে উঠে মারা যেতে পারে। এতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা অনেক কমে যেতে পারে।

পানিতে অক্সিজেনের উৎস (Source of Oxygen in Water)

যেসব উৎস থেকে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়, সেগুলো হলো ঃ

ক) বায়ুমন্ডল (Atmosphere)

বায়ুমন্ডলীয় বাতাস বিশেষ করে পানি সংলগ্ন বাতাস থেকে অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস হতে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার জন্য জলাশয়ে পানির স্বাভাবিক মিশ্রণ ও পানির ঢেউ বা আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে উপরিভাগের পানির আলোড়ন যত বেশি হবে পানিতে অক্সিজেন তত বেশি দ্রবীভূত হবে।

খ) সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis)

ক্লোরোফিলধারী বা বহনকারী জলজ উদ্ভিদ, বিশেষ করে ফাইটোপ্ল্যাংকটন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পানিতে অক্সিজেন তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ফাইটোপ্ল্যাংকটনের সালোকসংশ্লেষণ অনেকগুলো শর্তের ওপর নির্ভর করে। গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো হলো ঃ

- ❖ পানিতে আলোর প্রবেশ্যতা
- ❖ অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের ঘনত্ব বিশেষতঃ ফসফরাস ও নাইট্রোজেনের ঘনত্ব
- ❖ পানির পিএইচ
- ❖ পানির সর্বমোট ক্ষারত্ব বা খরতা
- ❖ দিনের সময়
- ❖ ঋতু
- ❖ খামারের ভৌগলিক অবস্থান
- ❖ পানির ঘোলাত্ব
- ❖ আবহাওয়া, ইত্যাদি

অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা (Solubility of Oxygen in Water)

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ চিংড়ি বা মাছচাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ২১% হলেও এর কম অংশই পানিতে মেশে।

পানিতে কি পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তা যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ঃ

- ➢ তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যায় এবং আর্দ্রতা বাড়লে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়;
- ➢ লবণাক্ততা বেড়ে গেলে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়;
- ➢ বায়ুর চাপ কমে গেলে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাসের কারণসমূহ (Causes for Decreasing Dissolve Oxygen in Water)

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস পাওয়ার জন্য যে সব কারণ দায়ী, সেগুলো হলো ঃ

- ➢ চিংড়ি বা মাছ ছাড়াও অন্যান্য জীব যথা- ব্যাকটেরিয়া, ফাইটোপ্ল্যাংকটন, জলজ উদ্ভিদ, জুপ্ল্যাংকটন কর্তৃক শ্বসন;
- ➢ অত্যধিক মজুদ ঘনত্ব ও অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ;
- ➢ জৈব পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থের পঁচন;
- ➢ মেঘলা আবহাওয়ার কারণে পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর অভাবে সালোকসংশ্লেষণ না হওয়া;
- ➢ পুকুরে ভূগর্ভস্থ অধিক আয়রন যুক্ত পানি সরবরাহ;
- ➢ প্রখর রৌদ্রের কারণে বা আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে;
- ➢ ঘোলাত্ব বৃদ্ধি পেলে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পানি থেকে ডিও বাতাসে ফিরে যায়;
- ➢ পুকুরে ফাইটোপ্লাংটনের ঘনত্ব অধিক হলে শ্বসনে অধিক ডিও ব্যবহারের কারণে।

দ্রবীভূত অক্সিজেন স্বল্পতার লক্ষণ (Syptomps of Low Dissolved Oxygen)

দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা যখন ক্ষতিকর বা প্রাণঘাতী মাত্রার (৩ পিপিএম এর কম) নিচে নেমে যায় তখন চিংড়ি বা মাছে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা দেয় ঃ

- চিংড়ি বা মাছ পানির উপরিভাগে অস্বাভাবিক ও অস্থিরভাবে ভেসে বেড়ায় এবং খাবি খেতে দেখা যায়;
- চিংড়ি বা মাছ ঘেরের পাড়ে চলে আসে এবং ডাঙ্গায় উঠে আসতে চায়;
- পুকুরের উপরিভাগে সরের মত বুদ্‌বুদ্‌ জমা হয়;
- পুকুরের তলা থেকে বুদ্‌বুদ্‌ আকারে গ্যাস ওঠে;
- পুকুরের শামুকসমূহ কিনারে চলে আসে;
- দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাবের জন্য যখন মাছ মারা যায় তখন তার মুখ খোলা অবস্থায় থাকে এবং ফুলকা ফেটে যায়

অক্সিজেন স্বল্পতার প্রতিকার (Remedy For Oxygen Shortage)

- পানিতে ঢেউ সৃষ্টির মাধ্যমে, যেমন- সাঁতার কাটা, বাঁশ পেটানো, পাম্প দিয়ে ঘেরে পানি ফেলে;
- এ্যারেটরের সাহায্যে বায়ু সরবরাহের মাধ্যমে;
- ঘেরে নতুন পানি সরবরাহের মাধ্যমে;
- বর্তমানে বেস্ট অক্সিজেন, অক্সি-ফ্লো, কুইক অক্সিজেন, O_2-মেরিন ও প্রোবায়োটিক ইত্যাদি ব্যবহার করে অক্সিজেন স্বল্পতার দ্রুত প্রতিকার করা যায়

ছবিঃ পাম্পের মাধ্যমে ফোয়ারা সৃষ্টি করে পানিতে অক্সিজিন বৃদ্ধি (স্থানীয় পদ্ধতি)

জৈবিক অক্সিজেন ডিমান্ড (বিওডি) (Biological Oxygen Demand)

- একটি পুকুরের সকল জীব যে পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহার করে তাকেই অক্সিজেনের বিওডি বা জৈবিক ডিমান্ড বলা হয়;
- রোগবাহী জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) জৈব পদার্থের পঁচন ক্রিয়ায় ২৪ ঘন্টায় ১-৩ পিপিএম ডিও ব্যবহার করতে পারে;
- রাতে ফাইটোপ্ল্যাংকটনসহ পানিতে বিদ্যমান জীব শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ৫-১৫ পিপিএম ডিও ব্যবহার করতে পারে;
- মাছে রাত ও দিন ২৪ ঘন্টাই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চালু থাকে। এতে ২৪ ঘন্টায় ২-৬ পিপিএম ডিও ব্যবহৃত হতে পারে;
- ডিও রাতে হ্রাস পায়, কারণ এ সময়ে সকল জীব শ্বাস প্রশ্বাসের কাজে অক্সিজেন গ্রহণ করে। কিন্তু সূর্যের আলো না থাকায় রাতে অক্সিজেন তৈরি হয়না। দিনের বেলায় অক্সিজেন বৃদ্ধি পায়, কারণ সে সময় উদ্ভিদ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে কার্বন-ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে অক্সিজেন তৈরি করে পানিতে অবমুক্ত করে। এই প্রক্রিয়ায় দৈনিক ৫-২০ পিপিএম ডিও তৈরি বা বৃদ্ধি পেতে পারে;
- তাছাড়া বাতাস ও ঢেউ এর ফলেও পানিতে ১-৫ পিপিএম ডিও মিশ্রিত হয়

১০) কার্বন-ডাই-অক্সাইড(Carbon-di-Oxide)

দ্রবীভূত অক্সিজেনের উচ্চ মাত্রার উপস্থিতিতে চাষযোগ্য মাছের প্রজাতি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উচ্চ মাত্রা সহ্য করতে পারে। তবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ২০ মিগ্রা/লি হলে তা মাছের জন্য ক্ষতিকর। পুকুরে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৫ মিগ্রা/লি এর নিচে থাকা ভাল। সাধারণত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

জীবের দ্রুত শ্বসন প্রক্রিয়ার কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়। পুকুরের পানিতে যখন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, শ্বসন প্রক্রিয়ার চেয়ে দ্রুত হয় তখন অক্সিজেন জমা হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমে যায়। ইহা সাধারণত একটি পুকুরের দিনের সাধারণ ঘটনা। আবার রাতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে কিন্তু শ্বসন ক্রিয়া দিনে এবং রাতেও চলতে থাকে। এভাবে পানিতে রাতে অক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মেঘলা আবহাওয়ার সময় অথবা ব্যাপক হারে ফাইটোপ্লাংকটন মারা যাওয়ার সময় পুকুর বা ঘেরে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়।

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longleftrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + heat energy

কার্বন-ডাই-অক্সাইড অম্লীয় প্রকৃতির হয়। $CO_2 + H_2O = HCO_3^- + H^+$

পুকুর বা ঘেরে এ্যারেশনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমানো যায় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে পারে। এছাড়াও ০.৮৪ মিগ্রা/লি মাত্রার ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড {$Ca(OH)_2$}এবং ০.৬৪ মিগ্রা/লি মাত্রার ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) এর প্রয়োগ, ১ মিগ্রা/লি মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমাতে কার্যকর হিসেবে দেখা গেছে।

১১) অ্যামোনিয়া (Ammonia)

ঘের বা খামারের পানিতে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি পানি দূষণের সূচনা করে। উচ্চ পিএইচ ও তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া অধিক বিষাক্ত হয়। পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থ, অব্যবহৃত খাদ্য ও জলজ আগাছার পঁচন এবং জলজ প্রাণীর মলমূত্র ত্যাগের ফলে পানিতে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। পানিতে প্লাংকটনের আধিক্যের পর যখন এদের মৃত্যু ঘটে তখন অ্যামোনিয়ার মাত্রা খুব বেড়ে যায়। সেই সাথে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি ও পিএইচ এর মাত্রা কমে যায়। ফলে পানি অম্লীয় হয়ে যায়। খামারের পানিতে মুক্ত অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি চিংড়ি বা মাছর ক্লেশ, স্বাস্থ্যহানি, বৃদ্ধি ব্যাহত ও মৃত্যু ঘটাতে পারে।

দুই প্রকার অ্যামোনিয়ার মধ্যে অ-আয়োনিত অ্যামোনিয়া (NH_3) চিংড়ি বা মাছ ও মাছের জন্য মারাত্মক বিষাক্ত। কিন্তু আয়োনিত অ্যামোনিয়া (NH_4+) বিষাক্ত নয়।

$$NH_3+H_2O \longleftrightarrow NH_4^+ + OH^-$$

অ-আয়োনিত অ্যামোনিয়ার বিষাক্ততা কমানোর জন্য পিএইচ এর সহনীয় মাত্রা হলো ৭.৫ - ৮.৫। যখন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় তখন অ্যামোনিয়ার বিষাক্ততা বেড়ে যায়। মুক্ত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.১ পিপিএম এর কম থাকাই বাঞ্ছনীয়। অ্যামোনিয়ার বিষাক্ততার মাত্রা ০.৪ - ২.০-মিগ্রা/লি। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ০.৪৫ পিপিএম মাত্রায় অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে চিংড়ি বা মাছের উৎপাদন অর্ধেক কমে যায়। তাই খামারে মুক্ত অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি ভালভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং বৃদ্ধির কারণগুলি রোধ করা দরকার। পুকুরে বেশি মাত্রায় আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করলে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বাড়তে পারে। জলজ পরিবেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও পিএইচ এর অসামঞ্জস্যতা মুক্ত অ্যামোনিয়ার মাত্রা বাড়ায়। এমতাবস্থায়, পানি পরিবর্তন ও চুন প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। অ্যামোনিয়ার বিষাক্ততা কমাতে প্রোবায়োটিক অথবা জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২) হাইড্রোজেন সালফাইড(Hydrogen Sulphide)

পচনশীল জৈব পদার্থের বায়ুবিহীন পচনক্রিয়ায় ঘেরের তলদেশে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি হয় এবং পানিতে নিঃসরিত হয়ে জারিত সালফেট এ পরিণত হয়। খামারের পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতি মাছ ও চিংড়ি বা মাছর মারাত্মক ক্ষতি করে। চিংড়ি বা মাছচাষে অ-আয়োনিত হাইড্রোজেন সালফাইডের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা ০.০৩ পিপিএম এর কম। কম পিএইচ ও বেশি তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন সালফাইড বেশি বিষাক্ত হয়। সালফাইড হলো হাইড্রোজেন সালফাইডের আয়োনিত উপাদান (**$H_2S = S_2^- + H^+$**) হাইড্রোজেন সালফাইড সঞ্চিত হলে তলদেশের মাটিতে পঁচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাটি কালো বর্ণ ধারণ করে। ০.১-০.২ পিপিএম মাত্রার হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতিতে চিংড়ি বা মাছের ক্লেশ হয়, ভারসাম্য হারায় ও খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে চিংড়ি বা মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এই মাত্রা ০.৪ পিপিএম হলে চিংড়ি বা মাছ মারা যায়। খামার প্রস্তুতকালীন সময়ে কালো কাদা অপসারণ করে, শুকিয়ে বা তলদেশ ধৌত করে এবং চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পরিবর্তন করে এবং বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য রোধ করা যায়।

সহায়ক তথ্য সূত্র

১) 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল' প্রকাশনায় Strengthening of Fishery and Aquaculture Food Safty and Quality Management System in Bangladesh, Department of Fisheries, Better Work and Standards Programme-Better Fisheries Quality (BEST-BFQ), UNIDO.

২) "মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুশীলন ও গুণগতমানসম্পন্ন মৎস্যবীজ ব্যবহার" প্রকাশনায় বিভাগীয় উপপরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

৩) "চিংড়ির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাক্টিস" প্রকাশনায় বাংলাদেশ কোয়ালিটি সাপোর্ট প্রোগ্রাম-ফিসারিজ, ইউনিডো

৪) ইন্টারনেট